বঙ্গবন্ধু ও কৃষি ভাবনা

বাঙালী জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে অধিকার আদায়ের নিরবচ্ছিন্ন প্রেরণা যুগিয়েছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে ১০ জানুয়ারি বিজয়ীর বেশে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে এসে, নিজেকে সঁপে দেন স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে এবং অর্থনৈতিক মুক্তিলাভের সংগ্রাম। এক বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন- “আমার চাল নাই, ডাল নাই, রাস্তা নাই, রেলওয়ে ভেঙে দিয়ে গেছে, সব শেষ করে দিয়ে গেছে ফেরাউনের দল”।

যুদ্ধপরবর্তী সময়ে যখন উন্নত দেশগুলো বাংলাদেশের মাঝে কোন আশার আলো দেখতে পাননি, তখন তিনিই সর্বপ্রথম অনুধাবন করেছিলেন, কৃষিনির্ভর এ দেশকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে হলে কৃষির উন্নতির বিকল্প নেই। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, বাংলার মাটি সোনার চেয়েও খাঁটি। তিনি দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে “কৃষক বাঁচাও দেশ বাঁচাও” স্লোগানে সবুজ বিপ্লবের ডাক দেন।

কৃষি খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে ১৯৭২-৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুর সরকারের প্রথম বার্ষিক বাজেটে, ৫০০ কোটি টাকার মধ্যে ১০১ কোটি টাকা শুধু কৃষি উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করেছিলেন। প্রথম বাজেটেই কৃষি ও কৃষকদের উন্নয়নে কৃষিখাতে ভর্তুকির ব্যবস্থা করেন। বাজেটে ভর্তুকি দিয়ে বিনামূল্যে কীটনাশক ও সার সরবরাহ করেন। এ ছাড়াও ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষিকর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। কৃষি পণ্য বিশেষ করে ধান, পাট, আখের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে ন্যূনতম ন্যায্যমূল্য বেঁধে দিয়েছিলেন। ব্যবস্থা করেছিলেন গরিব কৃষকদের রেশনের।
সহায়-সম্বলহীন ২২ লাখ কৃষক পরিবারের পুনর্বাসনের দায়িত্ব নেন। তাদের পুনর্বাসনে স্বল্পমূল্যে এবং অনেককে বিনামূল্যে বীজ, সার ও কীটনাশকসহ বিভিন্ন কৃষি উপকরণ প্রদান করেন। ১৯৭২ সালে বাংলার ভূমিহীন কৃষকদের জন্য রাষ্ট্রপতির বিশেষ আদেশে পরিবার প্রতি জমির মালিকানা ৩৭৫ বিঘা থেকে কমিয়ে ১০০ বিঘায় করেন এবং ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করেন। ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং- ১৩৫ এর মাধ্যমে নদী কিংবা সাগরগর্ভে জেগে ওঠা চরের জমির মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে নিয়ে দরিদ্র কৃষকদের মাঝে বণ্টন করেন। বিলোপ করেন হাট-বাজারের ইজারা প্রথা।

কৃষিতে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের জন্য ১৯৭৩ সালের ৭ নং আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেন কৃষি ব্যাংক, যাতে কৃষক সহজেই কৃষি ঋণ নিতে পারে। মহাজন ও ভূমিদস্যুদের হাত থেকে গরিব কৃষকদের রক্ষাই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য। এ ছাড়াও কৃষিঋণ মওকুফ, সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার ও খাস জমি বিতরণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

১৯৭২ সালের শেষের দিকে স্বল্পমূল্যে কৃষকদের জন্য ৪০ হাজার অগভীর, ২ হাজার ৯শ গভীর এবং ৩ হাজার শ্যালো টিউবওয়েল স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। এর ফলে ১৯৬৮-৬৯ সালের তুলনায় ১৯৭৪-৭৫ সালে সেচের জমি এক-তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৬ লাখ একরে। সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের পাশাপাশি কেবল ১৯৭২ সালেই ১৭ হাজার ৬১৬ টন উচ্চ ফলনশীল ধান ও গমের বীজ বিতরণের ব্যবস্থা করেন। এছাড়াও বিশ্ব বাজারের তুলনায় কম মূল্যে সার সরবরাহ করা হয়। এসব পদক্ষেপের ফলে রাসায়নিক সার ৭০ শতাংশ, কীটনাশক ৪ শতাংশ এবং উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। বঙ্গবন্ধুর সরকার কৃষকদের মাঝে দেড় লাখ গবাদিপশু ও ৩০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করেন। ১৯৭৩ সালে গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প পুনঃউদ্যোমে চালুর ব্যবস্থা করেন। সরকারিভাবে খাদ্য মজুতের জন্য ১৯৭২ সালের মধ্যে ১শ গোডাউন নির্মাণ করেন। কৃষিজ পণ্যের ক্ষুদ্র বিক্রেতাদের শুল্ক থেকেও অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের আমলে। কৃষি গবেষণা ছাড়া যে কৃষির উন্নতি সম্ভব নয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে এদেশে কৃষি গবেষণাধর্মী কাজ পরিচালনার জন্য তেমন কোনো সমন্বয়ধর্মী প্রতিষ্ঠান ছিল না। তাই তো ১৯৭৩ সালেই কৃষিতে গবেষণা সমন্বয়ের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল। সেই সঙ্গে কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকারের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে পুনর্গঠিত ও সম্প্রসারিত করেন।

সরকারের কৃষি গবেষণা বিভাগকে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট নামে একটি স্বায়ত্তশাসিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুনর্গঠনের জন্য তিনিই উদ্যোগ নেন। ১৯৭৩ সালে ১০ নং আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট নামে পুনর্গঠন করেন। সেই সময় তিনি ঢাকার আণবিক গবেষণা কেন্দ্রে কৃষি পারমাণবিক গবেষণা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচার (ইনা) প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দেন, যা ১৯৭৫ সালের শেষের দিকে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার

এগ্রিকালচার (বিনা) হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে স্থানান্তরিত হয়।

স্বাধীনতার পর জুট অ্যাক্ট-এর মাধ্যমে প্রাক্তন জুট এগ্রিকালচার রিসার্চ ল্যাবরেটরিকে বাংলাদেশ জুট রিসার্চ ইনস্টিটিউট নামে পুনর্গঠন করেন। তাছাড়া, তিনি ঈশ্বরদীতে প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট। একই সঙ্গে হর্টিকালচার উন্নয়ন বোর্ড, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, তুলা উন্নয়ন বোর্ডসহ অনেক নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেন শুধুমাত্র কৃষকদের নিকট সম্প্রসারণ সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য। তিনি মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করেন এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের বিদ্যমান কার্যক্রম ও অবকাঠামো সম্প্রসারিত করেন। মৎস্য ও পশুসম্পদের উন্নতির জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়। এছাড়াও দুগ্ধ উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থাকে তরান্বিত করতে গড়ে তোলেন মিল্ক ভিটা। একইসাথে ভর্তুকি মূল্যে তিনি কৃষকদের মাঝে ১ লাখ হালের বলদ ও ৫০ হাজার গাভী সরবরাহ করেন। গরিব কৃষকদের মাঝে তিনি সহজ শর্তে ১০ কোটি টাকার ঋণ ও ৫ কোটি টাকার সমবায় ঋণ বিতরণের ব্যবস্থাও করেন।

১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐ নির্বাচনী জোটের অংশীদার হয়ে প্রার্থী হন কোটালিপাড়া-গোপালগঞ্জ আসনে। ঐ জোটের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির ২১ দফা কর্মসূচির মধ্যে প্রধান ছয়টি দফাই ছিল কৃষি ও কৃষক শ্রমিকদের ভাগ্যোন্নয়ন ও স্বার্থের কথা। দফাগুলো আরও বিশ্লেষণ করলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, ২১ দফা কর্মসূচিই ছিল দেশের কৃষক-শ্রমিক ও কৃষির উন্নয়নের প্রথম রাজনৈতিক দলিল। কৃষি ও কৃষকদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাাভাবনা বেশ তীক্ষ্ম ও প্রকট ছিল বলেই তাঁকে যুক্তফ্রন্ট সরকারের কৃষি, বন, সমবায় ও পল্লীমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

কৃষির প্রতি বঙ্গবন্ধুর যে অকৃত্তিম ভালবাসা এবং উপলব্ধি তা প্রস্ফুটিত হয়েছিলো ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের এক বিশাল জনসভায় দেওয়া বক্তব্যে। সেদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন- “আমার দেশের এক একর জমিতে যে ফসল হয় জাপানের এক একর জমিতে তার তিনগুণ ফসল হয়। কিন্তু আমার জমি দুনিয়ার সেরা জমি। আমি কেন সেই জমিতে দ্বিগুণ ফসল ফলাতে পারব না, তিনগুণ করতে পারব না? আমি যদি দ্বিগুণও করতে পারি তাহলে আমাকে খাদ্য কিনতে হবে না। আমি চাই বাংলাদেশের প্রত্যেক কৃষক ভাইয়ের কাছে, যারা সত্যিকার

কাজ করে, যারা প্যান্টপরা, কাপড়পরা ভদ্রলোক তাদের কাছেও চাই জমিতে যেতে হবে, ডবল ফসল করুন। প্রতিজ্ঞা করুন, আজ থেকে ওই শহীদদের কথা স্মরণ করে ডবল ফসল করতে হবে। যদি ডবল ফসল করতে পারি আমাদের অভাব ইনশাআল্লাহ হবে না”।

কৃষির সার্বিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর যে দূরদর্শী চিন্তাভাবনা ছিল এবং কতটুকু গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা ১৯৭৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয়া তার ভাষণেই ফুটে ওঠেছিল যা একটি ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে আজও সাক্ষ্য দেয়।

তিনি বলেছিলেন- “কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছি। সবুজ বিপ্লবের কথা আমরা বলছি। যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশের যে অবস্থা, সত্য কথা বলতে কী বাংলার মাটি, এ উর্বর জমি বারবার দেশ-বিদেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে ও শোষকদের টেনে এনেছে এই বাংলার মাটিতে। এই উর্বর এত সোনার দেশ যদি বাংলাদেশ না হতো, তবে এতকাল আমাদের থাকতে হতো না। যেখানে মধু থাকে, সেখানে মধুমক্ষিকা উড়ে আসে। সোনার বাংলা নাম আজকের সোনার বাংলা নয়। বহু দিনের সোনার বাংলা। বাংলার মাটির মতো মাটি দুনিয়ায় দেখা যায় না। বাংলার মানুষের মতো মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না। বাংলার সম্পদের মতো সম্পদ দুনিয়ায় পাওয়া যায় না”।

তিনি আরও বলেছিলেন- “যেভাবে মানুষ বাড়ছে যদি সেভাবে আমাদের বংশ বৃদ্ধি হতে থাকে, তবে ২০ বছরের মধ্যে বাংলার মানুষ বাংলার মানুষের মাংস খাবে। সে কারণেই আমাদের কৃষির দিকে নজর দিতে হবে। আপনাদের কোট-প্যান্ট খুলে একটু গ্রামে নামতে হবে। কেমন করে হালে চাষ করতে হয়, এ জমিতে কত ফসল হয়, এ জমিতে কেমন করে লাঙল চষে, কেমন করে বীজ ফলন করতে হয়। আগাছা কখন পরিষ্কার করতে হবে। ধানের কোন সময় নিড়ানি দিতে হয়। কোন সময় আগাছা ফেলতে হয়। পরে ফেললে আমার ধান নষ্ট হয়ে যায়। এগুলো বই পড়লে হবে না। গ্রামে যেয়ে আমার চাষি ভাইদের সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল কাজ করে শিখতে হবে। তাহলে আপনারা অনেক শিখতে পারবেন”।

বঙ্গবন্ধু খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, কৃষিশিক্ষায় মেধাবী শিক্ষার্থী না আসলে এই খাতের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই কৃষিশিক্ষায় আকৃষ্ট করার জন্য ১৯৭৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (বাকসু) কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন মঞ্চে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়াদের মতো কৃষিবিদদের চাকরিক্ষেত্রে প্রথম

শ্রেণির পদমর্যাদা ঘোষণা করেন। সাথে সাথেই “বঙ্গবন্ধুর অবদান, কৃষিবিদ ক্লাস ওয়ান” ¯স্লোগানে স্লোগানে প্রকম্পিত হয় সেই সমাবর্তন স্থলটি। তার সেই ঐতিহাসিক ঘোষণার পথ ধরে আজ কৃষিবিদরা সরকারি চাকরিক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণির গেজেটেড পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন।

শুধু তাই নয়, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষি গ্র্যাজুয়েটদের তিনি কৃষি বিপ্লব সফল করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন- “খাদ্য শুধু চাল, আটা নয়; মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, তরিতরকারিও আছে”। কৃষি উন্নয়ন বলতে তিনি শস্য, মৎস্য, পশুপাখি ও বনসম্পদ অর্থাৎ সার্বিক কৃষি খাতের উন্নয়নকে বুঝিয়েছেন। তিনি তার বিভিন্ন বক্তৃতায় আমাদের উর্বর জমি, অবারিত প্রাকৃতিক সম্পদ, পশু-পাখি, মৎস্য, বনাঞ্চল ও পরিবেশের কথাও উল্লেখ করেছেন। এসবের ওপর গবেষণা ও সম্প্রসারণ কর্মসূচির সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করে তিনি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের নিদের্শনাও দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন- “খাদ্যের জন্য অন্যের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। আমাদের নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য নিজেদেরই উৎপাদন করতে হবে। আমরা কেন অন্যের কাছে খাদ্য ভিক্ষা চাইব। আমাদের উর্বর জমি, আমাদের অবারিত প্রাকৃতিক সম্পদ, আমাদের পরিশ্রমী মানুষ, আমাদের গবেষণা সম্প্রসারণ কাজে সমন্বয় করে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করব। এটা শুধু সময়ের ব্যাপার”।

কৃষি উপকরণের বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাচেতনা যা ছিল তা আজ এত বছর পরেও আমাদের আশ্চার্যন্বিত করে। মানসম্মত বীজ উৎপাদন এবং বিতরণ, সুষ্ঠু সার ও সেচ ব্যবস্থাপনা, বালাই ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনা, খামারভিত্তিক ফসল ব্যবস্থাপনা, সমবায় ভিত্তিক চাষাবাদ, বীজবিষয়ক কার্যক্রম এসবের ওপর সর্বাত্মক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কেননা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এগুলো যথাযথভাবে না করতে পারলে আমরা অনেক পিছিয়ে যাবো।

বঙ্গবন্ধুর মতোই তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বারবার দেশের জনগণের প্রতি আহ্বান করেন যে-“এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে। যে যেভাবেই পারেন, প্রতিটি ইঞ্চি জায়গার সদ্ব্যবহার করবেন”। তিনি আরও বলেন- “বাংলাদেশ এখন খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশ। তার পরেও বসে থাকলে চলবে না”। কৃষিবিদদের মর্যাদা নতুন মাত্রায় উন্নীত করতে, কৃষিবিদ ও কৃষকের মর্যাদার প্রতীক পেশাজীবী সংগঠনের প্রাণকেন্দ্র কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটশন বাংলাদেশ-এর নান্দনিক ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে জমি বরাদ্দসহ দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। সময়ের ব্যবধানে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তারই কৃষক-কৃষিবিদ সহায়কনীতি ও প্রণোদনায় ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ৩য়, সবজি উৎপাদনে ৩য়, আম উৎপাদনে ৭ম, আলু উৎপাদনে ৮ম, পেয়ারা উৎপাদনে ৮ম এবং মৎস্য উৎপাদনে ৪র্থ অবস্থানে রয়েছে। আবাদি জমি কমেছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিগুণ কিন্তু খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৪ গুণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বে কৃষি উন্নয়নের এক অনুকরণীয় রোল-মডেলে পরিণত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু আজ নেই, তিনি আছেন বাংলার প্রতিটি মানুষের হৃদয়ের মনিকোটায়। পূর্বের ন্যায় সেই খাদ্যের অভাব এখন আর দৃষ্টিগোচর হয় না। কৃষি উৎপাদন ডাবল, ক্ষেত্রবিশেষে তার চেয়েও বেশি হয়েছে। নেই কোন খাদ্য সংকট। খাদ্যশস্যও এখন উদ্বৃত। এ দেশের কৃষক এখন আর শোষিত ও বঞ্চিত নন বরং তারা সম্মানিত। যেমনটি চেয়েছিলেন আজকের এই কৃষি উন্নয়নের অগ্রদূত “বঙ্গবন্ধু”।

ড. মোঃ মনিরুল ইসলাম (সোহাগ): প্রফেসর, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।